পাটকাঠি বিক্রি করে লোকসান তুলতে হচ্ছে মেহেরপুরের পাট চাষিদের

মেহেরপুরে কয়েক বছর যাবৎ বৈরী আবহাওয়ার কারনে সেচের পানি ব্যবস্থা করে পাট আবাদ করেছিলেন চাষিরা। ভাল লাভের আশায় পাট চাষ করলেও কাংখিত ফলন বিপর্যয় ও ন্যায্য দাম না পাওয়ায় হতাশ চাষিরা। চাষিরা বলছেন এবছর পাটের আঁশ কম এবং দামও কম। খরচের টাকায় উঠছেনা। পাটের মূল্যবৃদ্ধি না হলে আগামীতে পাট চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

পাট চাষরিা বলছেন, কয়েক বছর ধরে মেহেরপুর জেলায় অনাবৃষ্টি ও প্রচন্ড তাপদাহের কারনে পাটের আবাদে উৎপাদন খরচ হয়েছে দ্বিগুণ। পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ফলন বিপর্যয় ঘটেছে। পাটের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে অনেক চাষি পাটের আবাদ ছেড়ে দিয়েছেন। এবছরেও অনেক চাষি পাটের আবাদ করেছেন বুকভরা আশা নিয়ে। কিন্তু সে ‘গুড়ে বালি’ এবছরেও পাটের ফলন হচ্ছেনা,আবার দামও কম। পাট উৎপাদনে যে টাকা খরচ হয়েছে তা উঠছেনা। এমনটা চলতে থাকলে আগামিতে আর পাট চাষ করবেননা চাষিরা।

জেলা কৃষি বিভাগর তথ্য মতে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুরের গাংনী,মুজিবনগর, সদরসহ মোট তিনটি উপজেলায় ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। জেলায় এবছর ২ লাখ ৪০ হাজার ৬৩৬ বেল পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। রোপনকৃত সব পাটই প্রায় মেচিওউর হয়ে গেছে । জমি থেকে পাট কেটে পুকুর ডোবা কিংবা জমিতেই স্যালোমেশিন দিয়ে পানির ব্যবস্থা করে পাট পচানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পানি না পাওয়ায় পাটের রং হচ্ছে কালো। এতে দাম কম পাচ্ছেন পাট চাষিরা। বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাংশের পাটের আঁশ তুলনামূলক কম ও রংয়ের পার্থক্য থাকায় সরকার নির্ধারিত মুল্য থেকে বঙ্চিত হচ্ছেন। পাট ব্যবসায়ীরা জানান, এবছর শুকনা পাট বিকিকিনি চলছে ১৯০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা।

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের পাটচাষি ইদ্রিস আলী জানান, তিনি চৈত্র মাসের শেষের দিকে দুই বিঘা জমিতে পাট বীজ রোপন করেছিলেন। অতিখরার কারনে দুদিন পরপর সেচ দিতে হতো। নিড়ানি,সার,বিষসহ

সোনালী হওয়ার পরিবর্তে কাদাযুক্ত কালো হচ্ছে। যার ফলে এখানকার পাটের চাহিদা একেবারেই কম। পাট প্রক্রিয়াজাতকরন কোন কোম্পানি পাট কিনতে চাচ্ছেনা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলায় অনাবৃষ্টির কারনে পাট বাড়তে পারেনি। আঁশ হয়েছে পাতলা। ওজনও কম হচ্ছে। খালে বিলে পাট পচানোর জন্য পানি না পেয়ে কৃষকরা গর্ত করে সেচ দিয়ে পাট পঁচানোর ব্যবস্থাকরছেন। এতে পাটের যে প্রকৃত রং তা হচ্ছেনা। ফলে নদী এলাকার পাটের তুলনায় দাম কম পাচ্ছেন। তারপরেও সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাট পঁচানো এবং আঁশ সংগ্রহে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।